331090 - কাল্পনিক শিক্ষণীয় গল্প লেখা

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু একটি কাল্পনিক গল্প লেখার পর আমি আপত্তি করেছিলাম। আমার বন্ধু গল্পটির মাধ্যমে পাঠকের সামনে শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরতে চেয়েছে। কিন্তু আমার আপত্তিটি ছিল দুটো দিক থেকে: এক. গল্পের কাল্পনিক চরিত্রগুলো কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দেয়। আমি তাকে জানিয়েছি যে, সে তো আলেম নয়। সে তো জানে না যে, এটি কি জায়েয; নাকি নাজায়েয। দুই. সে গল্পটিকে একটি কাল্পনিক স্থান ও সময়ে চিত্রিত করেছে; যে স্থান ও সময় মানব জাতির ইতিহাসের অংশ নয়। যেন সে আমাদের জগতের বাইরে অন্য এক জগত তৈরী করে নিয়েছে। যেহেতু তার গল্পে আপনি আরব উপদ্বীপ বলে কিছু পাবেন না এবং এ ধরণের অন্য বিষয়গুলো। একই সময় সে তার গল্পে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছে; যাতে করে গল্পটা শিক্ষণীয় হয়। তাই কাল্পনিক, অবাস্তব গল্পে কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

কাল্পনিক গল্প ও উপন্যাস যদি শিক্ষণীয় হয় এবং কল্যাণ ও ভালোর দিকে আহ্বান করে তাহলে এগুলো রচনা করা জায়েয। এসব গল্পে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতির প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে করা হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না। বিস্তারিত জবাবটি পড়ুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক: কাল্পনিক গল্প-উপন্যাস লেখার বিধান

ইতিপূর্বে 174829 নং প্রশ্নোত্তরে কাল্পনিক গল্প-উপন্যাস লেখার হুকুম সম্পর্কে আলেমদের মতামতগুলো আলোচিত হয়েছে এবং শিক্ষামূলক গল্প হলে, কল্যাণ ও ভালোর দিকে আহ্বান করলে এমন গল্প লেখা জায়েয হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

আরও বেশি জানতে 278767 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুই: কাল্পনিক গল্পে আয়াত কিংবা হাদিস ব্যবহার করা

এসব গল্পে কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতির প্রয়োগ যদি যথাযথভাবে হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি প্রতীয়মান হয় না।

কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রাসূল: এর কোন কোনটির প্রমাণ সুস্পষ্ট। এর অর্থ বুঝার জন্য কোন ব্যক্তির অধিক জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। বরং সাধারণতঃ প্রত্যেক পাঠকই এর অর্থ বুঝতে পারে। যেমন যে আয়াতগুলো নামায, যাকাত, হজ্জ, সিয়াম ইত্যাদি ফরয আমলগুলোর নির্দেশ দেয় এবং যে আয়াত ও হাদিসগুলো উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দেয় এবং বিপরীত চরিত্র থেকে নিষেধ করে...ইত্যাদি।

তাই কোন লেখকের জন্য এমন আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে দলিল দিতে কোন আপত্তি নেই। যেহেতু এগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট; এতে কোন অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই। তবে এমন কিছু আয়াত ও হাদিস আছে যেগুলোর অর্থ বুঝার জন্য ব্যক্তির ইলমের প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে ওয়াজিব হল এর অর্থ অনুসন্ধান করা এবং আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করা। যে ব্যক্তি এ ধরণের আয়াত ও হাদিসের অর্থ জানে না তার জন্য এগুলো দিয়ে দলিল দেয়া জায়েয হবে না। কেননা হতে পারে তিনি সে আয়াত ও হাদিসগুলো দিয়ে এমন ক্ষেত্রে দলিল দিবেন সে দলিলগুলো যা নির্দেশ করছে না।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের তাফসিরকে চার প্রকার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "তাফসির চার প্রকার: এক প্রকার তাফসির আরবরা তাদের কথা থেকে জানতে পারে। এক প্রকার তাফসির না বুঝার ক্ষেত্রে কারো কোন ওজর নেই। এক প্রকার তাফসির আলেমেরা জানেন। আর এক প্রকার তাফসির আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না; এমন তাফসির যে ব্যক্তি জানার দাবী করে সে মিথ্যুক।"[ইবনে জারীর তাঁর তাফসিরের ভূমিকাতে (১/৭০, ৭৩) এ উক্তিটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে কাছিরও তাঁর তাফসিরের ভূমিকাতে (১/১৪) উল্লেখ করেছেন]

জারকাশি তাঁর 'আল-বুরহান' নামক গ্রন্থে (২/১৬৪-১৬৭) বলেন: "এই বিভাজনটি সঠিক। ১। যে প্রকারটি আরবরা তাদের ভাষার ভিত্তিতে জানেন; সেটা ভাষা ও ব্যাকরণগত...। যে তাফসির এই শ্রেণীর অধিভুক্ত সেটার ক্ষেত্রে মুফাস্সিরের তাফসির করার পদ্ধতি আরবদের ভাষায় যা উদ্ধৃত সেটার উপর সীমাবদ্ধ হবে। আরবী ভাষার খুঁটিনাটি ও প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের কোন কিছুর তাফসির করার অধিকার নেই। মুফাস্সিরের আরবী ভাষার সামান্য জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়। কারণ হতে পারে শব্দটি দ্বৈত অর্থবোধক হবে; আর তিনি কেবলমাত্র দুটো অর্থের মধ্যে একটিমাত্র অর্থ জানেন।

২। যে তাফসির না-জানার ক্ষেত্রে কারো কোন ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। তা হচ্ছে কুরআনের যে অর্থ অবলীলায় অবগত হওয়া যায়; যেমন যে আয়াতগুলোতে শরয়িতের বিধিবিধান ও তাওহীদের নির্দেশনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেকে শব্দ একটি মাত্র পরিস্কার অর্থ প্রকাশ করছে; অন্য কিছু নয় এবং জানা যায় যে, এটাই আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য। এ প্রকারের হুকুমে কোন মতভেদ নেই এবং এর ব্যাখ্যাতে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। উদাহরণতঃ প্রত্যেকে ব্যক্তিই আল্লাহ্র বাণী: "জেনে রাখুন; তিনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।" থেকে একত্ববাদ ও উপাসনায় যে তাঁর কোন অংশীদার নেই সেই অর্থ বুঝে থাকে। প্রত্যেকে ব্যক্তি অনিবার্যভাবে জানতে পারে যে, আল্লাহ্র বাণী "নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর।" এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের দাবী হচ্ছে— নামায ও রোযার ফরযিয়ত (আবশ্যকতা)।

৩। যে তাফসির আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটো হচ্ছে যা গায়বী (অদৃশ্যের জ্ঞান) শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। যেমন যে সকল আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, বৃষ্টি নামা, গর্ভাশয়ে কি আছে, রূহের ব্যাখ্যা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে...।

৪। যে তাফসির আলেমদের ইজতিহাদ নির্ভর। এ শ্রেণীর তাফসিরকে সাধারণতঃ 'তা'বীল' বলা হয়। তা'বীল (تأويل) এর মানে হল শব্দটিকে এর লক্ষ্যার্থে অর্থান্তরিত করা। আর সেটো হচ্ছে— বিধি-বিধান উদ্ভাবন, অ-ব্যাখ্যাত ভাবকে ব্যাখ্যাকরণ, সামগ্রিকিতাকে সীমাবদ্ধকরণ। প্রত্যেকে এমন শব্দ যা দুই বা ততোধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এমন শব্দের ক্ষেত্রে আলেম ছাড়া অন্য কারো ইজতিহাদ করা নাজায়েয।"[কিঞ্চিত পরিমার্জনসহ সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।